অভিসরণ / ABHISARON
A Multilingual International Peer-Reviewed Research Journal
Volume 1, Issue II, July 2026, PP. 36-43
www.abhisaron.com
ISSN-3139-4027(Online)
DOI - https://dx.doi.org/10.67757/abhisaron.2026.v1i2.005

The Toto Tribe: Cultural Transformation in the Context of Modernization / টোটো জনজাতি: আধুনিকায়নের প্রেক্ষাপটে সংস্কৃতির রূপান্তর

SANCHITA DUTTA / সঞ্চিতা দত্ত
পিএইচ. ডি. গবেষক, ডিপার্টমেন্ট অফ পারফরমিং আর্টস (মিউজিক),
সিস্টার নিবেদিতা ইউনিভার্সিটি, নিউটাউন
Email: sanchitadutta6666@gmail.com

Accepted: 04.07.2026
Published: 20.07.2026

Keywords:
Toto Tribe, Totopara, Indigenous Community, Toto Language, Mother Tongue-Based Education, Modernization, Cultural Change, Language Preservation, Sustainable Development.

Abstract:
The Toto tribe is one of the smallest Indigenous communities in India, primarily inhabiting Totopara in the Alipurduar district of West Bengal. They possess a distinct language, culture, and social tradition. In recent decades, modernization, education, improved communication, tourism, and various government development initiatives have brought significant socio-economic changes to Toto society. However, these changes have also created challenges in preserving their native language, cultural heritage, and ethnic identity. This paper examines the social structure, economy, education, language, culture, and the impact of modernization on the Toto community. It also highlights the importance of mother tongue-based education and cultural preservation for ensuring the sustainable development and continued identity of the Toto people.

Discussion:

টোটো হলো ভারতের অঙ্গরাজ্য পশ্চিমবঙ্গের আলিপুরদুয়ার (তৎকালীন অবিভক্ত জলপাইগুড়ি) জেলার মাদারীহাট থানার অন্তর্গত একটি অত্যন্ত ক্ষুদ্র এবং আদিম জনজাতি (Primitive Tribe)। ভৌগোলিক ও সামাজিক দিক থেকে এই জনগোষ্ঠী অত্যন্ত স্বতন্ত্র, কারণ সমগ্র বিশ্বের মধ্যে কেবল একটিমাত্র গ্রামেই এদের আদি বাসস্থান সীমাবদ্ধ। তোর্ষা নদীর পূর্ব তীরে এবং ভারত-ভুটান সীমান্তের কোল ঘেঁষে অবস্থিত এই গ্রামটির নাম 'টোটোপাড়া'। গ্রামটির সামগ্রিক ভৌগোলিক আয়তন প্রায় ১৯৯১.৫৯ একর। এটি মূলত ভূটান সীমান্তের তাড়িং পাহাড়ের দক্ষিণ ঢালে অবস্থিত। ভৌগোলিক স্থানাঙ্ক অনুযায়ী এটি ২৬°৫০' উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৯°২০' পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত। পাহাড়ি ঝোরা, বন্ধুর পার্বত্য ঢাল এবং ঘন ক্রান্তীয় অরণ্যে ঘেরা এই অঞ্চলটি বিংশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্তও আধুনিক সভ্যতা এবং দেশের মূল ভূখণ্ড থেকে প্রায় সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ছিল। স্বল্প জনসংখ্যা, নিজস্ব ভাষা, স্বতন্ত্র সামাজিক সংগঠন, ধর্মীয় বিশ্বাস এবং প্রকৃতিনির্ভর জীবনব্যবস্থার জন্য টোটো সমাজ নৃতাত্ত্বিক গবেষণায় একটি বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। দীর্ঘকাল ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতার কারণে এই জনগোষ্ঠী মূলধারার সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের বাইরে ছিল। ফলে তাদের মধ্যে নিজস্ব ভাষা, লোকবিশ্বাস, সামাজিক রীতি, বিবাহপ্রথা এবং অর্থনৈতিক জীবনযাত্রা দীর্ঘদিন ছিল অপরিবর্তিত। কিন্তু স্বাধীনতার পর এবং বিশেষত একবিংশ শতাব্দীতে উন্নয়নমূলক প্রকল্প, আধুনিক শিক্ষা, যোগাযোগ ব্যবস্থা, প্রশাসনিক সম্প্রসারণ, পর্যটন এবং বাজার অর্থনীতির প্রভাবে টোটো সমাজে দ্রুত পরিবর্তন ঘটতে শুরু করে। নৃতত্ত্ববিদদের মতে, আধুনিকায়নের প্রভাব আদিবাসী সমাজে দ্বিমুখী ফলাফল সৃষ্টি করে। একদিকে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পায়; অন্যদিকে ঐতিহ্যগত সংস্কৃতি, মাতৃভাষা, সামাজিক মূল্যবোধ এবং জাতিগত পরিচয়ের উপর গভীর প্রভাব পড়ে। টোটো সমাজেও এই দ্বৈত বাস্তবতা স্পষ্টভাবে লক্ষ করা যায়।

টোটো জনগোষ্ঠীর ইতিহাস সন্ধান করতে গেলে যে সমস্ত প্রাথমিক ঐতিহাসিক নথিপত্র পাওয়া যায়, তার মধ্যে অন্যতম প্রাচীন হলো ১৮১৫ খ্রিষ্টাব্দের একটি প্রতিবেদন। তৎকালীন রংপুরের এক উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী বাবু কৃষ্ণকান্ত বসু ব্রিটিশ সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে ভূটান ভ্রমণ করেন এবং তাঁর রচিত 'একাউন্টস্ অব ভুটান' (Accounts of Bhutan) নামক প্রতিবেদনে সর্বপ্রথম এই রহস্যময় 'টোটো' জনজাতির অস্তিত্বের কথা লিপিবদ্ধ করেন। পরবর্তীতে সাভার্স সাহেবের জলপাইগুড়ি জরিপ সংক্রান্ত প্রতিবেদন (১৮৬৫-১৮৭২), বিভিন্ন দশকীয় সরকারি আদমশুমারি এবং গেজেটিয়ারে এই জনগোষ্ঠীর সমাজজীবনের খণ্ডচিত্র ফুটে ওঠে। আধুনিক যুগে অধ্যাপক বিক্রমকেশ্বরী রায়বর্মন টোটোদের সমাজ ও অর্থনীতির ওপর প্রথম নিয়মতান্ত্রিক ও পুঙ্খানুপুঙ্খ নৃতাত্ত্বিক গবেষণা সম্পন্ন করেন এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট উপাধি লাভ করেন। পরবর্তীতে বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী ডঃ চারুচন্দ্র সান্যাল তাঁর কালজয়ী গবেষণার মাধ্যমে টোটোদের সামগ্রিক জীবনযাত্রার পূর্ণাঙ্গ চিত্র বিশ্বদরবারে উন্মোচিত করেন। বর্তমানে জনসংখ্যার ভিত্তিতে তাদের অবস্থাঃ

"এখন জনসংখ্যা আগের চেয়ে খানিকটা বেড়েছে। ১৯৫১র জনসংখ্যা অনুযায়ী ৬৯টি পরিবারে টোটোর সংখ্যা ছিল ৩২১ জন। ১৯৯১ সালে ১৮০টি পরিবারে জনসংখ্যা হয় ৯২৬। ২০০১ সালে জনসংখ্যা দাঁড়ায় ১১৮৪। এখন জনসংখ্যা ১৪৬৮।" [১]

নৃতাত্ত্বিকদের নিখুঁত বিশ্লেষণ অনুযায়ী, টোটোরা হলো মূলত 'তিব্বত-মঙ্গোলয়েড' (Tibeto-Mongoloid) নৃ-গোষ্ঠীর একটি অত্যন্ত প্রাচীন শাখা। এদের শারীরিক অবয়বে মঙ্গোলয়েড বা মোঙ্গোলীয় জনজাতির সুস্পষ্ট চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। এদের সাধারণ গাত্রবর্ণ বাদামি থেকে গাঢ় বাদামি হয়ে থাকে; তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে বেশ কালো বা কৃষ্ণবর্ণের ত্বকও চোখে পড়ে, যা নৃতাত্ত্বিকদের মতে অতীতে অন্য কোনো অন্তর্বর্তী বা প্রতিবেশী আদিম জনগোষ্ঠীর সাথে রক্তমিশ্রণের অকাট্য ইঙ্গিত বহন করে। টোটোদের দৈহিক গঠন অত্যন্ত

সুঠাম, শক্তসমর্থ এবং পাহাড়ি জীবনের কঠোর পরিশ্রমের উপযোগী। এদের মাথার চুল সাধারণত সোজা, শক্ত ও কালো এবং মুখে দাড়ি-গোঁফের আধিক্য বেশ বিরল। প্রাচীনকালে টোটো পুরুষেরা ভুটিয়া ঐতিহ্যের অনুকরণে মাথায় লম্বা চুল রাখতেন এবং তা বেঁধে রাখতেন; তবে আধুনিক যুগে বৈশ্বিক সংস্কৃতির প্রভাবে এই দীর্ঘ কেশ রাখার রীতি সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়েছে। টোটোপাড়ার প্রবীণ ও বয়োজ্যেষ্ঠদের মৌখিক ইতিহাস এবং বংশানুক্রমিক লোকগাথা পর্যালোচনা করলে জানা যায় যে, তারা প্রায় আট পুরুষ ধরে বর্তমান টোটোপাড়া গ্রামে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। এই অঞ্চলে স্থানান্তরের পূর্বে তাদের পূর্বপুরুষেরা বর্তমান টোটোপাড়া থেকে প্রায় আট কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত ভুটানের পার্বত্য অঞ্চল 'দিয়াংছু'-তে বাস করতেন। তারও আগে প্রাচীনতর কালে তারা আরও প্রত্যন্ত উত্তর ভুটানের 'য়াতুং' উপত্যকার স্থায়ী বাসিন্দা ছিলেন।

"জলপাইগুড়ি জেলার বিভিন্ন তথ্য থেকে দেখা যায় বর্তমান টোটোপাড়া ছাড়াও এ জেলার আরো চারটি গ্রামে টোটোরা বসবাস করতেন। এই গ্রামগুলি হচ্ছে, তগাঁও (টগাঁও), তোতাপাড়া, তৎপাড়া ও তোতপাড়া। এই গ্রামগুলির নামের সঙ্গে টোটো বা তোতোদের নাম জড়িত। বয়স্ক টোটোদের উচ্চারণ থেকে এটাও অনুমান করা যায় যে টোটো নামের সাবেক উচ্চারণ ছিল 'তোতা' বা 'তোতো'। কিন্তু রোমান বা ইংরাজি হরফের বানানের অসতর্ক উচ্চারণের ফলে বর্তমানে তা 'টোটো'তে (ToTo) পরিণত হয়েছে।" [২]

ভুটানি রাজপ্রশাসনের অধীনে থাকার সময় টোটোদের জীবন অত্যন্ত মানবেতর ছিল; তারা সেখানে ভুটানি সামন্তপ্রভুদের অধীনে ভারবাহী দাসপ্রজা বা স্থানীয় ভাষায় 'জাপো' হিসেবে বাধ্যতামূলক শ্রম দিতে বাধ্য হতেন। পরবর্তীতে ব্রিটিশ-ভারত ও ভুটানের মধ্যে সুদীর্ঘকালের সীমান্ত বিরোধ মেটানোর উদ্দেশ্যে যখন চূড়ান্ত সীমান্ত রেখা চিহ্নিতকরণ করা হয়, তখন একটি ঐতিহাসিক administrative বিভ্রান্তি বা সীমানা নির্ধারণের আকস্মিকতার কারণে 'টোটোপাড়া' নামক এই ভূখণ্ডটি ব্রিটিশ ভারতের সীমানার অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। এই ভৌগোলিক অন্তর্ভুক্তি টোটোদের ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী আশীর্বাদ হিসেবে প্রমাণিত হয়, কারণ এর ফলে তারা ভুটানি রাজাদের সুদীর্ঘকালীন দাসত্ব ও বাধ্যতামূলক শ্রমের জোয়াল থেকে স্থায়ী মুক্তি লাভ করেন এবং ব্রিটিশ ভারতের স্বাধীন ও স্বশাসিত প্রজায় রূপান্তরিত হন।

পারিপার্শ্বিক বহুবিধ প্রতিকূলতা, ক্ষুদ্র জনসংখ্যা এবং আধুনিকায়নের তীব্র চাপ সত্ত্বেও টোটো সম্প্রদায় আদিমকাল থেকে তাদের নিজস্ব মাতৃভাষা এবং অনন্য সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যকে সগৌরবে টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছে। প্রখ্যাত ভাষাবিদ বি. এইচ. হডসন, স্যার জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়ারসন এবং ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ অনুযায়ী, টোটোদের ভাষা হলো মূলত 'তিব্বত-বর্মী'(Tibeto-Burman) ভাষা পরিবারের অন্তর্গত 'Non-Pronominalised' বর্গের একটি বিশিষ্ট উপভাষা। গত এক শতাব্দী বা তারও বেশি সময় ধরে এই ভাষাটি তার ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে প্রতিবেশী বাংলা, নেপালি, মেচ এবং ভুটিয়া ভাষার প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে এসেছে এবং পারস্পরিক আদান-প্রদানের মাধ্যমে এর শব্দভাণ্ডারে ব্যাপক রূপান্তর ও সমৃদ্ধি ঘটেছে। টোটো জনজাতির তরুন প্রজন্মের জন্য সত্যজিৎ টোটো শব্দসংগ্রহ করেছিলেন এবং মাতৃভাষার অগ্রসরের চেষ্টা করেছেন। এরকম কয়েকটি টোটো শব্দ ও বাংলা অর্থ দেওয়া হল -

"অঙওয়া- পুড়ে যাওয়া
অঙপাওয়া- পোড়াচ্ছি
অঙদিংনা- পুড়ছে
অঙরো- পুড়বে
অঙপারো- পোড়াব

অঙনা- পুড়েছে
অঙপুনা- পুড়ে গেছে
অঙটে- বাসি ভাত
অঙতি- বীজ
অঙসে- দানা
আঙনা- পান করেছি
আঙদিংনা- পান করছি
আঙরো- পান করব
আঙনেরো- পান করতে হবে
আনা- দিদি
আনাবি- দিদিরা
আনাজু- বড় শালি
আঙদুঙ- কাপড়
আতে- কাকিমা
আ-সা- তারপর?" [৩]

ঐতিহাসিকভাবে টোটোদের নিজস্ব কোনো লিপি বা হরফ ছিল না এবং তাদের কোনো লিখিত সাহিত্যভাণ্ডার গড়ে ওঠেনি। ফলে তাদের সুপ্রাচীন ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সম্পূর্ণভাবে মৌখিক লোকসাহিত্যের ওপর ভর করে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে প্রবাহিত হয়ে এসেছে। টোটোদের এই মৌখিক লোকসাহিত্যকে প্রধানত তিনটি সুনির্দিষ্ট ধারায় ভাগ করা যায়— লোককথা (Folk tales), লোকগীতি (Folk songs) এবং ধর্মীয় বা ওঝাতান্ত্রিক উপাচারের মন্ত্র। টোটোদের আদিম ঐতিহ্যবাহী লোকসঙ্গীত এবং বিশেষ করে 'লেতিরেহা' (যা মূলত স্বপ্নদ্রষ্টা বা সাধকদের দ্বারা গীত বিশেষ আধ্যাত্মিক গান) অত্যন্ত দুর্বোধ্য এবং রূপকধর্মী। বর্তমান প্রজন্মের তরুণ-তরুণীদের উদাসীনতা এবং আধুনিক বিনোদনের প্রসারের কারণে এই প্রাচীন গানগুলো এখন চরম বিলুপ্তির মুখোমুখি। আধুনিক যুগে ডিজিটাল মিডিয়া এবং টেলিভিশনের সহজলভ্যতার কারণে টোটোদের প্রাত্যহিক বিনোদন ও সাংস্কৃতিক জীবনে প্রতিবেশী নেপালি লোকসঙ্গীত ও আধুনিক বাংলা সংস্কৃতির গভীর অনুপ্রবেশ ঘটেছে। ফলস্বরূপ, বর্তমানকালে যেকোনো সামাজিক বা পারিবারিক উৎসব-অনুষ্ঠানে তারা ঐতিহ্যবাহী বাদ্যযন্ত্রের পরিবর্তে আধুনিক নেপালি বাদ্যযন্ত্র, মাইক ও সাউন্ড সিস্টেম ব্যবহার করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করছেন।

টোটো সমাজের সামাজিক ও ধর্মীয় জীবন কঠোর রীতিনীতি এবং অনুশাসনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। বাহ্যিকভাবে তাদের জীবন উৎসবমুখর মনে হলেও, তাদের বিবাহ বা সাধারণ সামাজিক আনন্দানুষ্ঠানে যেকোনো ধরনের আমোদপ্রমোদমূলক নাচগান অথবা বাদ্যযন্ত্রের যথেচ্ছ ব্যবহার ঐতিহ্যগতভাবে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। সামাজিক অনুশাসন অনুযায়ী, শুধুমাত্র তাদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব 'ওমছু' (যাকে মহাকাল পূজা বা বড় উৎসব বলা হয়) এবং 'ময়ূরপূজা' ছাড়া বছরের অন্য কোনো সময়ে বা সামাজিক অনুষ্ঠানে ঐতিহ্যবাহী বাদ্যযন্ত্র বাজানোর কোনো নিয়ম বা ধর্মীয় অনুমতি নেই। এই পূজা-পার্বণগুলোর আচার-অনুষ্ঠান অত্যন্ত ব্যয়বহুল। পূজার জাঁকজমক রক্ষা করতে এবং দেবতাদের উদ্দেশ্যে পশুবলি ও বিপুল পরিমাণ উপচার সামগ্রী সংগ্রহ করতে গিয়ে দরিদ্র ও সরলমনা টোটোরা প্রায়শই চরম আর্থিক সংকটে পড়েন। এই সুযোগে স্থানীয় বহিরাগত মহাজন ও ওঝা বা

'ঝাঁকড়ি'-রা তাদের চড়া সুদে ঋণ দেয় এবং পরবর্তীতে দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক ও মানসিক শোষণের জালে আবদ্ধ করে ফেলে।

টোটো সমাজে পূর্বে যৌথ পরিবারের প্রাধান্য ছিল। একই পরিবারের একাধিক প্রজন্ম একত্রে বসবাস করত এবং সম্পদ ও শ্রমের যৌথ ব্যবস্থাপনা ছিল সামাজিক জীবনের একটি বৈশিষ্ট্য। কিন্তু আধুনিক অর্থনৈতিক পরিবর্তন, চাকরির প্রয়োজন এবং শিক্ষার জন্য স্থানান্তরের ফলে বর্তমানে একক পরিবারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর ফলে পারিবারিক সম্পর্কের ধরনেও পরিবর্তন এসেছে। পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারী ও তরুণদের অংশগ্রহণও পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। টোটো সমাজে নারীরা ঐতিহ্যগতভাবে কৃষিকাজ, গৃহস্থালি, সন্তান লালন-পালন এবং সামাজিক অনুষ্ঠানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছেন। আধুনিক শিক্ষার বিস্তার নারীদের সামাজিক অবস্থানের উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। বর্তমানে বহু টোটো নারী বিদ্যালয় ও উচ্চশিক্ষায় অংশগ্রহণ করছেন।

টোটো জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় জীবন প্রকৃতিপূজাভিত্তিক। পাহাড়, নদী, বন, সূর্য, বৃষ্টি এবং বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তিকে কেন্দ্র করে তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস গড়ে উঠেছে। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান শুধু বিশ্বাসের বিষয় নয়; এটি সামাজিক ঐক্য, সাংস্কৃতিক পরিচয় এবং লোকজ ঐতিহ্যের অন্যতম ভিত্তি। সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের প্রভাবে কিছু টোটো পরিবার খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেছে। এর ফলে ধর্মীয় বৈচিত্র্য সৃষ্টি হলেও ঐতিহ্যবাহী উৎসব, লোকবিশ্বাস এবং সামষ্টিক আচার-অনুষ্ঠানের ধারাবাহিকতায় পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। সমাজবিজ্ঞানীদের মতে, ধর্মীয় পরিবর্তনের সঙ্গে সাংস্কৃতিক পরিবর্তনেরও গভীর সম্পর্ক রয়েছে। কারণ ধর্মীয় বিশ্বাস পরিবর্তনের ফলে লোকসংস্কৃতি, সংগীত, উৎসব এবং সামাজিক রীতিনীতিতেও পরিবর্তন ঘটে। টোটোদের সাংস্কৃতিক জীবন লোকসংগীত, নৃত্য, উৎসব, মৌখিক সাহিত্য এবং ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সমৃদ্ধ। তাদের প্রতিটি উৎসবের সঙ্গে গান, নৃত্য এবং সামষ্টিক অংশগ্রহণ নিবিড়ভাবে যুক্ত। বর্তমানে টোটোপাড়া একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যটনকেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, টোটো জনগোষ্ঠীর স্বতন্ত্র সংস্কৃতি এবং সীমান্তবর্তী অবস্থানের কারণে প্রতি বছর বহু পর্যটক এখানে আসেন। পর্যটনের ফলে স্থানীয় মানুষের আয় বৃদ্ধি, ক্ষুদ্র ব্যবসার প্রসার এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। তবে পর্যটনের কিছু নেতিবাচক প্রভাবও রয়েছে। বাণিজ্যিকীকরণের ফলে সাংস্কৃতিক উপাদান অনেক সময় প্রদর্শনীর বস্তুতে পরিণত হচ্ছে। ফলে উন্নয়নের সঙ্গে সাংস্কৃতিক সংরক্ষণের ভারসাম্য রক্ষা করা অত্যন্ত জরুরি।

আদিম জীবনযাত্রার প্রতিফলন হিসেবে টোটোদের পোশাক-পরিচ্ছদ অত্যন্ত সাধারণ, অনাড়ম্বর এবং কৃত্রিমতাহীন। এদের পোশাকের বুনন ও পরিধান শৈলীর সাথে প্রতিবেশী ভুটিয়াদের পোশাকের বাহ্যিক সাদৃশ্য থাকলেও কিছু মৌলিক পার্থক্য রয়েছে; যেমন ভুটিয়াদের পোশাকের মতো টোটোদের পোশাকে কোনো আধুনিক সেলাই বা হাত সম্পূর্ণ ঢাকার কোনো ব্যবস্থা বা হাতা থাকে না। টোটোদের পোশাক মূলত কাপড়ের কয়েকটি সোজা টুকরো দিয়ে গঠিত, যা পরিধান করার সময় বাঁশ বা কাঠের তৈরি অত্যন্ত সরু ও সূক্ষ্ম ফালির (যাকে স্থানীয় ভাষায় 'পিন' বলা হয়) সাহায্যে শরীরের আড়াআড়িভাবে কাঁধের ওপর শক্ত করে আটকে রাখা হয়। এক সময় টোটোরা অত্যন্ত স্বাবলম্বী ছিলেন এবং তারা নিজেদের জমিতে উৎপাদিত তুলা থেকে চরকার মাধ্যমে সুতো কেটে ঘরের মেঝেতে পাতা আদিম তাঁতে নিজেদের পরিধেয় বস্ত্র নিজেরাই তৈরি করতেন। ঐতিহ্যগতভাবে তাদের সমস্ত পোশাকের মূল রঙ ছিল নিষ্কলঙ্ক সাদা। ঐতিহ্যানুযায়ী একজন টোটো নারী তার শরীরে মোট চার

টুকরো স্বতন্ত্র কাপড় পরিধান করেন, যার প্রতিটির নিজস্ব নাম ও ব্যবহারিক গুরুত্ব রয়েছে:

মেরা: এটি হলো নারীদের প্রধান পরিধেয় বস্ত্র, যা মূলত কোমর থেকে শুরু করে হাঁটু বা তার সামান্য নিচ পর্যন্ত শরীরের নিম্নভাগকে আবৃত করে রাখে।

বিজি: এটি একটি বিশেষ ধরনের কোমরবন্ধনী বা চওড়া কাপড়, যা কোমরের চারপাশে শক্ত করে বেঁধে রাখা হয়। এটি পরিধানের কৌশল এমন যে, তা ভেতরের দিকে একটি সুরক্ষিত থলি বা পকেটের মতো ধারণ করে, যেখানে নারীরা তাদের প্রাত্যহিক প্রয়োজনীয় টুকিটাকি জিনিসপত্র রাখেন।

তুম্বা: এটি নারীদের বক্ষদেশ আবৃত করার জন্য ব্যবহৃত একটি সুনির্দিষ্ট বক্ষবন্ধনী কাপড়।

পারি: এটি একটি অতিরিক্ত চাদর বা বস্ত্রখণ্ড, যা সাধারণত সমাজ স্বীকৃত বিবাহিত নারীরাই সামাজিক মর্যাদা ও শালীনতার প্রতীক হিসেবে শরীরের ওপরের অংশে ব্যবহার করে থাকেন।

অন্যদিকে টোটো পুরুষেরা তাদের প্রাত্যহিক ও উৎসবের জীবনে সাধারণত তিন টুকরো সাদা সুতি কাপড় ব্যবহার করেন -

গালো বা বাওহা: এটি পুরুষদের প্রধান পোশাক, যা সাধারণত ৬ ফুট লম্বা এবং ৩ ফুট চওড়া এক টুকরো আস্ত সুতি চাদর। এই চাদরটি শরীরের সম্মুখ ও পশ্চাৎভাগ ঢেকে কাঁধের ওপর কাঠের পিনের সাহায্যে আড়াআড়িভাবে (Crosswise) সুনিপুণভাবে আটকে দেওয়া হয়, যা নিচের দিকে হাঁটু পর্যন্ত ঝুলে থাকে।

কোমরবন্ধ ও আংদুং: এই গালো-র ওপর কোমরের অংশে আরও এক টুকরো কাপড় শক্ত করে জড়িয়ে বাঁধা হয়। এই কোমরবন্ধনীটি বুকের কাছে কাপড়ের ভাজে একটি বড় পকেটের মতো ফোকর বা স্থান তৈরি করে, যেখানে টোটো পুরুষেরা তাদের অত্যন্ত প্রিয় পান, সুপারি, চুন এবং ধারালো ছুরি বা দা রেখে দেন। সামগ্রিক এই পুরুষ পোশাকের সেটটিকে টোটোদের নিজস্ব ভাষায় 'আংদুং' নামে অভিহিত করা হয়।

সংস্কৃতির অন্যতম অঙ্গ হিসেবে টোটো নারীরা প্রাচীনকাল থেকেই বিভিন্ন ধাতুর তৈরি অলংকার বা গহনা দিয়ে নিজেদের সাজাতে অত্যন্ত ভালোবাসেন। তারা প্রধানত কান, গলা এবং হাতের কবজিতে ভারী অলংকার পরিধান করেন। তাদের নিজস্ব শব্দভাণ্ডার অনুযায়ী অলংকারগুলোর নাম নিম্নরূপ-

ইরিংবা জীবিং: টোটো নারীদের হাতে পরিধান করার ঐতিহ্যবাহী বিশেষ মোটা চুড়ি বা বালা।

তি-সে: বিভিন্ন পুঁতি বা ধাতব খণ্ড দিয়ে তৈরি গলার বিশেষ মালা বা হার।

নারসি, নিবা বা কেয়ই: কানে পরিধান করার জন্য ব্যবহৃত ঐতিহ্যবাহী দুল, রিং বা কানের আংটি।

অতীতে অলংকার ব্যবহারের ক্ষেত্রে পুরুষদের মধ্যেও কিছু সুনির্দিষ্ট রেওয়াজ ছিল। প্রাচীনকালে টোটো পুরুষেরা তাদের যেকোনো এক হাতে কাঁসা অথবা পিতলের তৈরি অত্যন্ত ভারী ও নিরেট বালা পরিধান করতেন, যা তাদের বীরত্ব ও সামাজিক মর্যাদার প্রতীক ছিল। তবে আধুনিক যুগে পুরুষদের মধ্যে এই ভারী বালা পরার রীতি সম্পূর্ণ লোপ পেয়েছে; বর্তমানে তারা কেবল আঙুলে সাধারণ আংটি ছাড়া অন্য কোনো অলংকার ব্যবহার করেন না। বর্তমান সময়ে ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা দূর হওয়ার কারণে এবং প্রতিবেশী নেপালি ও বাঙালি সংস্কৃতির নিবিড় প্রভাবে টোটো নারীদের অলংকার ব্যবহারের প্রাচীন উপাদানে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। তারা এখন সনাতনী অলংকারের পরিবর্তে আধুনিক বাজার থেকে কেনা সোনা, রুপো, কাঁসা বা প্লাস্টিকের আধুনিক নকশার গহনা ব্যবহারে বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করছেন।

শিক্ষাবিদদের মতে, মাতৃভাষার পরিবর্তে দ্বিতীয় ভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা শিশুর বৌদ্ধিক বিকাশে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। এই কারণে টোটো শিশুদের মধ্যে বিদ্যালয়ত্যাগের প্রবণতা, শিক্ষার প্রতি অনাগ্রহ এবং দুর্বল শিক্ষাগত ফলাফল লক্ষ্য করা যায়। তাই টোটো সমাজে মাতৃভাষাভিত্তিক প্রাথমিক শিক্ষা চালু করা অত্যন্ত জরুরি। টোটো ভাষা তো শুধু যোগাযোগের মাধ্যম নয়; এটি তাদের জাতিগত ইতিহাস, লোকজ জ্ঞান, ধর্মীয় বিশ্বাস, মৌখিক

সাহিত্য, প্রবাদ-প্রবচন এবং সাংস্কৃতিক স্মৃতির ধারক। ভাষার মধ্য দিয়েই একটি জনগোষ্ঠী তার ঐতিহ্যকে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে বহন করে। ভাষা সংরক্ষণ ছাড়া টোটো জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক পরিচয় দীর্ঘমেয়াদে টিকিয়ে রাখা কঠিন হবে।

বিগত কয়েক দশকে সরকারি ও বেসরকারি নানাবিধ উদ্যোগের ফলে টোটোপাড়ার সামাজিক কাঠামোতে শিক্ষার আলো পৌঁছাতে শুরু করেছে। বর্তমানে টোটোপাড়ায় প্রতিষ্ঠিত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার প্রধান মাধ্যম হিসেবে এবং স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত ও অন্যান্য সরকারি-প্রশাসনিক কাজের দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে বাংলা ভাষার ব্যবহার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর ফলে বর্তমান প্রজন্মের টোটোদের মধ্যে বাংলা ভাষা অত্যন্ত সাবলীলভাবে বলতে, পড়তে এবং লিখতে পারার এক ব্যাপক ইতিবাচক প্রবণতা দেখা যাচ্ছে, যা সামগ্রিকভাবে এই অবহেলিত জনজাতির মধ্যে শিক্ষার হার ও সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিতে অভূতপূর্ব জোয়ার এনেছে। এদের মাঝে ধনীরাম টোটো ও সত্যজিৎ টোটো উল্লেখযোগ্য। টোটো জনজাতির ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির একজন গুরুত্বপূর্ণ গবেষক ও সাহিত্যিক হল ধনীরাম টোটো। টোটো ও বাংলা ভাষায় কবিতা, গান ও লোককাহিনি রচনা করেছেন এবং টোটো ভাষার জন্য একটি লিপি প্রণয়নের উদ্যোগ নেন। টোটো জনজাতির ইতিহাসে প্রথম উপন্যাস 'ধনুয়া টোটোর কথামালা' তাঁরই রচনা। এই উপন্যাসে টোটো জনগোষ্ঠীর ইতিহাস, লোকসংস্কৃতি ও কঠিন জীবনযাত্রা তুলে ধরা হয়েছে। "তখনকার দিনে বড় কঠোর ছিল টোটোদের জীবনযাত্রা।জন্মের পর জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে বসবাস করার কঠিন জীবন। স্থায়িত্ব, নিশ্চয়তা কিছুই ছিল না। অর্থ, সম্পত্তি এসবের বালাই ছিল না। জীবন ও জীবিকার জন্য প্রতি মুহূর্তের লড়াই। জীবজন্তুর আক্রমণ থেকে, রোগব্যাধি থেকে বাঁচার লড়াই।" [৪]

টোটো জনগোষ্ঠীর সামাজিক জীবন দীর্ঘদিন ধরে স্বজাতিকেন্দ্রিক, সমবায়ভিত্তিক এবং প্রকৃতিনির্ভর ছিল। তাদের সামাজিক সংগঠন পারিবারিক ঐক্য, পারস্পরিক সহযোগিতা এবং সামষ্টিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের উপর প্রতিষ্ঠিত। সমাজের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত— বিবাহ, ধর্মীয় অনুষ্ঠান, সামাজিক বিরোধের নিষ্পত্তি কিংবা উৎসব পালন সবই সমাজের প্রবীণ ব্যক্তিদের নেতৃত্বে সম্পন্ন হতো। এই সামাজিক কাঠামো টোটো সমাজে ঐক্য, সংহতি এবং পারস্পরিক নির্ভরশীলতার ভিত্তি গড়ে তুলেছিল। কিন্তু আধুনিক শিক্ষা, সরকারি প্রশাসনিক কাঠামো, আইনি ব্যবস্থা এবং বহির্বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ বৃদ্ধির ফলে এই ঐতিহ্যগত সামাজিক ব্যবস্থায় পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়েছে। বর্তমানে টোটো সমাজে ব্যক্তিকেন্দ্রিক জীবনধারা ধীরে ধীরে গুরুত্ব লাভ করছে। একসময় যৌথ সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে পরিচালিত সামাজিক কার্যক্রমে এখন ব্যক্তিগত মতামত ও অর্থনৈতিক সক্ষমতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সমাজের শিক্ষিত ও কর্মজীবী তরুণ প্রজন্ম আধুনিক জীবনধারার সঙ্গে দ্রুত অভিযোজিত হচ্ছে। ফলে প্রজন্মগত দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যও ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছে। প্রবীণরা যেখানে ঐতিহ্য সংরক্ষণের ওপর গুরুত্ব দিচ্ছেন, সেখানে নবীন প্রজন্ম আধুনিক শিক্ষা, প্রযুক্তি এবং কর্মসংস্থানের সুযোগকে অধিক গুরুত্ব দিচ্ছে। অন্যদিকে, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, বহিরাগত বসতি স্থাপন, ভূমির ব্যবহার পরিবর্তন এবং বনভূমির সংকোচনের ফলে টোটোদের ঐতিহ্যগত জীবনযাত্রা নানা সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। ভূমির মালিকানা সংকট এবং কৃষিজমির পরিমাণ হ্রাস পাওয়ায় অনেক পরিবার বিকল্প জীবিকার সন্ধান করছে। এর ফলে কৃষিনির্ভর জীবনধারা ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হচ্ছে এবং ঐতিহ্যগত পরিবেশজ্ঞানও হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। সমসাময়িক নৃতাত্ত্বিক গবেষণায় টোটো সমাজকে একটি পরিবর্তনশীল আদিবাসী সমাজ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। একদিকে আধুনিক শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন তাদের জীবনমান উন্নত করেছে; অন্যদিকে মাতৃভাষার সংকট, সাংস্কৃতিক পরিবর্তন, ধর্মীয় বৈচিত্র্য এবং সামাজিক বৈষম্য নতুন চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করেছে। উন্নয়নের প্রকৃত

সাফল্য তখনই সম্ভব, যখন অর্থনৈতিক অগ্রগতির পাশাপাশি ভাষা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং সামাজিক পরিচয়ের সংরক্ষণ নিশ্চিত করা যাবে।

Reference:

১। পণ্ডা, ডঃ দীপককুমার বড়, লোকজীবন ও লোকসংস্কৃতি, জ্ঞানপীঠ পাবলিকেশন, কলকাতা, ২০১২। পৃষ্ঠা.৬২
২। বিশ্বাস, রতন। সম্পাদনা, উত্তরবঙ্গের জাতি ও জনজাতি, পুনশ্চ, কলকাতা, ২০০০। পৃষ্ঠা.২৮
৩। টোটো, সত্যজিৎ। টোটো ভাষাকে ভালবাস, মাতৃভাষা, কলকাতা, ২০২১। পৃষ্ঠা.৭
৪। টোটো, ধনীরাম, ধানুয়া টোটোর কথামালা। অন্যতর পাঠ ও চর্চা, কলকাতা, ২০২১। পৃষ্ঠা.৬৮

Bibliography:

১। পণ্ডা, ডঃ দীপককুমার বড়, লোকজীবন ও লোকসংস্কৃতি, জ্ঞানপীঠ পাবলিকেশন, কলকাতা, ২০১২।
২। বিশ্বাস, রতন। সম্পাদনা, উত্তরবঙ্গের জাতি ও জনজাতি, পুনশ্চ, কলকাতা, ২০০০।
৩। টোটো, সত্যজিৎ। টোটো ভাষাকে ভালবাস, মাতৃভাষা, কলকাতা, ২০২১।
৪। টোটো, ধনীরাম, ধানুয়া টোটোর কথামালা। অন্যতর পাঠ ও চর্চা, কলকাতা, ২০২১।
৫। মিত্র, সনৎকুমার। পশ্চিমবঙ্গের লোকসংস্কৃতি বিচিত্রা। কলকাতা, ১৯৮১।
৬। ভট্টাচার্য, আশুতোষ। বাংলার লোকসংস্কৃতি। ন্যাশানাল বুক ট্রাস্ট। নয়াদিল্লি, ১৯৮২।
৭। চক্রবর্তী, বরুণকুমার। বাংলার লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস। কলকাতা, ১৯৯৯।
৮। চট্টোপাধ্যায়, সৌগত। লোকসংস্কৃতি: আজকের ভাবনা। বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০২২।
৯। চক্রবর্তী, বরুণকুমার। লোকসংস্কৃতি প্রসঙ্গ। অক্ষর প্রকাশনী, ২০১৩।
১০। সেনগুপ্ত, পল্লব। লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ (পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ)। পুস্তক বিপণি, ২০০২।

CC BY NC